ভ্রমণের গল্প

বিয়ে না-করে কিছুতেই ডিভোর্স করা যায় না, ডিভোর্সের আগে বিয়ে একটা থাকতেই হয়। বিয়ে-ডিভোর্সের লং-ডিসটান্স দৌড়টা ঠিকঠাক সম্পন্ন করার জন্যে, ডিভোর্সের এই পরমুখাপেক্ষী, নির্ভরশীল এবং গৌন অবস্থানটা আগেভাগে মাথায় বসিয়ে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। হ্যাঁ, গৌন। ডিভোর্স গৌন এবং বিয়েটা হল মুখ্য। এই দীর্ঘ-দূরত্ব-দৌড়ে প্রাথমিক এবং উজ্জ্বলতর মাইলস্টোনটা অবশ্যই বিয়ে। এক মাইলস্টোন থেকে আর এক মাইলস্টোনে, দৌড়ও, দৌড়ও, দৌড়ে চল, দৌড়ে চল একটা মাইলস্টোন থেকে আরেকটায়। দৌড়বে কী করে, যদি আগে থেকে না-জানো, কোন মাইলস্টোন কোথায়, কার গুরুত্ব কতটা?

এবং লং-ডিস্টান্স দৌড়ের মতই, এখানেও মূল ইস্যুটা হল ছন্দ, রিদম। দৌড়ের যে কোনো ট্রেনারকে দেখবেন, সবচেয়ে জোর দেয় এই জায়গাটার উপর। রিদম, রিদম-টা খুঁজে পাও — ঠিক রিদমের চেয়ে জোরে দৌড়লে তুমি শেষ করতে পারবে না, ট্র্যাক থেকে ফিরবে অন্যের পায়ে চেপে। আর, ঠিক রিদমের কমেই যদি থেমে গেলে, তুমি তোমার পুরো সামর্থ্যটা ব্যবহার করে উঠতে পারলে না, বিকশিত হল না তোমার পুরো প্রতিভা। বা, বিকশিত হয়ে উঠল না এই দীর্ঘ-দূরত্ব-দৌড়ের পুরো সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা। বিয়ে মানে তার অন্তরালে একটা প্রেমের প্রক্রিয়া, এবং প্রেম তো তাই যার মধ্যে উপ্ত হয়ে আছে জীবন ও সভ্যতার উর্বরতম সম্ভাবনাগুলো।

কেয়া এবং ত্রিদিব, অন্য অনেক অপ্রস্তুততর সহতৃতীয়বিশ্ববাসীর তুলনায় এই জায়গাটায় একটু ভিন্ন ছিল, তারা নিজেদের জীবনকে সচেতন নির্মাণ-পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণটাকে খুব জরুরি বলে মনে করত, দুজনেই। তাই, এবার যখন সময় এল বাঁকের মুখে বাঁশ আর ব্যানারের স্টল বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টুপি ও ব্যাচ পরা স্বেচ্ছাসেবকদের হাত থেকে ছোঁ মেরে বরফজলের প্যাকেটটা নেওয়ার, সময় কখন আসে সেটা বোঝা যায় আপনা থেকেই, বুঝতে হয়ই, সময়ই বুঝিয়ে দেয়, কেয়া-ত্রিদিবের মধ্যে একটা নোবল রিজলভ, মহত্ত্বপূর্ণ মনস্থৈর্য জন্ম নিল – তারা এবার নিজেরাই সমাধান করবে, কোনো বহিরাগত বরফজল নয়, নিজেরাই নিজেদের ভিতর জন্মিয়ে নেবে ছন্দটাকে। তারই সূত্র ধরে এল ভ্রমন এবং ভ্রমনের গল্প।

তখনো তারা জানত না, জানা সম্ভবও ছিল না, এই ভ্রমন কী কী আখ্যানের জন্ম দেবে, কী ভাবে তা বদলে দিতে থাকবে তাদের জীবন তথা জীবনোত্তর ইতিহাসকে।

খুব বিসদৃশ রকমের বিচিত্র রকমের আলাদা কিছু একটা যে ঘটে চলেছে তলায় তলায়, তার প্রথম ইঙ্গিতটা ত্রিদিব পেল টিকিট কাটতে গিয়ে। একটা বিদঘুটে চমক। জানতে পারল, রাজস্থানের টিকিটের দাম চারশো নব্বই টাকা থেকে এক লাফে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার আটশো চল্লিশ টাকায়।

টিকিট কাউন্টারে এই জনিত বিরক্ত বিস্ময় জানানো মাত্র এল দ্বিতীয় চমকটা : কেন, এটা তো যাওয়ার টিকিট, ফেরার টিকিটের দাম তো কমে গেছে, বত্রিশ টাকা মোটে, আসলে টিকিটের কোনো দামই নেই, ওটা শুধু রিজার্ভেশন চার্জ, সবাই যেতে চাইছে, কেউই তো ফিরতে চাইছে না রাজস্থান থেকে।

এই প্রত্যেকটা চমকই ছিল খুব অদ্ভুত, বিচিত্র। কিন্তু গা-ছমছমে অনুভূতিটা শুরু হয়েছিল আরো অনেকটা পরে, ট্রেনে ওঠার থেকে। দাম্পত্য পুনর্নির্মাণের রোমান্টিক আবহ, তাই নৈকট্য, তাই যৌনতা — এমনকি দু-একবার এরকমও মনে হয়েছিল, রাজস্থানের জায়গায় খাজুরাহো টাজুরাহো হলেই কি ভালো হত, ওখানকার ট্যুরিজম তো হানিমুন কনসেশন দেয় বলেও শুনেছে — তাই, সহরোমান্টিক হামসফর খুঁজে চলেছিল ওরা। অন্যান্য আরো মিষ্টি, নখরা-পরায়ণ, ঘনিষ্ঠ, খুনশুটিরত জোড়-দের। সবাইকেই দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তখনই লক্ষ্য করেছিল, গোটা কামরা জুড়ে পারিবারিক মানুষ কি অসম্ভব রকমের কম। চোখের সামনে প্রতিটি মানুষই একক, চুপচাপ, তাড়িত, ভিড় এড়িয়ে চলেছে। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না, বিরক্ত চোখে তাকাচ্ছে। আর তাদের প্রায় প্রত্যেকেই পুরুষ। এবং, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হল, তাদের অনেকেরই একটা দুটো করে আঙুল নেই হাতের, সকলের হাত দেখাও যাচ্ছে না। একটু নার্ভাস হয়ে গেল ত্রিদিব। ডাকাতি টাকাতি কিছু হবে না তো? নিজেকে যুক্তি দিল, সব লোকই যদি ডাকাত হয়, ডাকাতি করবে কার? কেয়াকে বলল না আর, পাছে বেড়ানোটাই মাটি হয়।

মাথায় কাজ করছিল, প্রোজেক্টটা যেন টিক করে, ফিরে গিয়ে আবার যেন একই অবস্থায় পড়তে না-হয়। সময়, টাকাপয়সা, পরিশ্রম — খরচ তো কম হল না, সেটা যেন নিষ্ফলা না-যায়। ট্রেনে আর খুব বেশি কিছু কী হবে — তাও সামান্য একটু সময় একটু পরস্পরের কাছাকাছি আসা গেল। জানলার বাইরে প্রচণ্ড ঝমঝম সশব্দে পিছনে ছিটকে যাচ্ছে রাত্তির, কখনো এক আধটা আকস্মিক আলো, কখনো না-থামা না-জানা ঘুম-ঘুম স্টেশনের নিঃসঙ্গ বেঞ্চির পাশে রাতধূসর কুকুর, কখনো এক লহমার একটা লেভেল-ক্রসিং-এর গায়ে চায়ের দোকানের বিষণ্ণ হলদে আলোয় দু-তিনটি মানুষ। চুল উড়ছে হুহু করে জানলার হাওয়ায়, মুখের আরাম ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। ত্রিদিব দু-চারবার ভাবল, কোনটা বেমানান হবে এখানে, কেয়াকে তার কাছে আসতে বলাটা, না, না-বলাটা। খুব বেশি রকমের বানানো লাগবে না তো? তারপর, যেমন হয়, গভীরতর একটা স্বতস্ফূর্ততা এসে মানুষের হ্যাঁ বা না-এর প্রশ্নটাকেই উড়িয়ে দেয়, আবেগের ঢেউয়ের মাথায় ছিটকে ওঠে ফেনা, বুদ্বুদ, পাকসাট খেয়ে ডানার ঝাপট দেয় জলের পাখি, অপ্রশ্নেয় অধিকারের গলায় ত্রিদিব বলেছিল, এই, কী হচ্ছে, এখানে এসো। কেয়াও, সময়ের গতি এভাবেই মানুষকে নিয়ে যায় তার নিজের বাইরে, বলেছিল, কেন, শোব না? আর, অনেকটা এগিয়ে এসেও থমকে গেছিল কেয়া, ত্রিদিব নিজের ভিতরকার ওঠানামা দিয়ে স্পষ্ট পাঠ করতে পেরেছিল কেয়ার থমকে যাওয়াটা, কোনটা এখানে বেশি মানাবে, আধকাতে ত্রিদিবের কাঁধে হেলান দিয়ে বসাটা,

নাকি, ওর কোলে মাথা রেখে — সেটা একটু ওভার হয়ে যাবে না তো?

তারপর, অনেক অনেকক্ষণ জুড়ে শুধু রাতের হাওয়ার ঝাপট, শুধু ত্রিদিবের কোলের উপর রাখা কেয়ার কপালের উড়ো উড়ো কুচি কুচি চুলে কখনো কামরার নীল ঘুমবাতির কখনো বাইরের অন্ধকারের কখনো কোনো স্টেশনের ল্যাম্পপোস্টের আলো — কমললতার কথা মনে পড়ে ত্রিদিবের, ঠিকমত নিজের যত্নটা নিয়ে উঠতে পারবে তো কমললতা, নিজের শয্যা থেকে শ্রীকান্তর চাদরটাও তো দিয়ে দিল ফিরিয়ে, কিছুই নিল না, তার মুখেও ছিল রাতের গতিশীল ট্রেনের জানলায় স্টেশনের আলোর খেলা — শুধু কমললতা চলে যাচ্ছিল দূরে, দূরে, নামরিক্ত গরঠিকানা প্রত্যাগমনহীন দূরে — আর কেয়া আছে সামনে এখানে, তার কোলে রাখা কেয়ার মাথায় চূর্ণকুন্তলের হাওয়াশিরশির শরীরে চলমান আলোর খেলা ত্রিদিবের চোখের ঠিক সামনে। সিচুয়েশনটা কমললতার সঙ্গে ঠিক মেলে না হয়তো, কিন্তু হুবহু আর কোন জিনিসটাই বা মেলে এই তৃতীয় বিশ্বের জীবনে। মেলাতে তো হয়ই। নিজের, নিজেদের প্রোজেক্টের কথা মনে পড়ে ত্রিদিবের, সে জানে যে কেয়া এটা জানে, এবং সে যে জানে এটাও কেয়া জানে, সচেতন সম্পর্কের মজাই এটা। মেলাতে যে হবেই, এটা জানে তারা, প্রোজেক্ট যদি সফল করতেই হয়।

একটা অনুভূতির সঙ্গে সমিল সক্রিয়তা বানিয়ে চলার সীমা থাকে একটা, কিছুতেই সেটা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বানিয়ে চলা যায় না, একটা সময়ে গিয়ে প্রক্রিয়াটা ফেটে যাবেই। তাই সমাধানটা হল, সেই অনুভূতিটাকেই বানিয়ে নেওয়া। আর সাহিত্য আছে কেন, যদি না তার চরিত্র হিসেবে বেঁচে নেওয়া যায় কিছুটা সময়? ঠিক তাই হয়, কমললতাকেন্দ্রিক অনুভূতির ছকটাকে নিজের ভিতর জ্যান্ত করে তোলে ত্রিদিব। একটা বাড়তি বিহ্বলতাও থাকে এখানে, কমললতাকে হারিয়ে ফেলতে হয়েছিল, আর কেয়া রয়েছে তার কোলে, তার দুই প্রেমিক হাতের নিরাপত্তায় ঘেরা। আবেগে আরামে আবেশে চোখ বুঁজে আসে ত্রিদিবের। সময় এখন বেঁকে আসে, আলোকরশ্মিও, আবছায়াবিজন সঙ্গোপন জেগে ওঠে মানবমানবীকে ঘিরে। আধোঘুম ঘিরে আসে ত্রিদিবকে, ঘুমের আবছায়ার মধ্যেও সে টের পায় রাতজামাঢাকা কেয়ার পিঠ থেকে তার নিজের ঘুমঘুম হাত সরে এলেই, আবার পরের মুহূর্তেই ফিরে যাচ্ছে হাতের জায়গায়, কেয়াকে নিরাপদ রাখছে। ঘুমের আরামে আদুরে কেয়াও টের পায়, নিশ্চিন্ত থাকে।

সচেতন সক্রিয় সম্পর্কের সমস্ত মজা এখানেই শেষ নয়। আরো অনেক ক্রীড়ামোদ জন্মায় ও জেগে থাকে এখন দুই মিলনবিধুর মানুষকে ঘিরে। ত্রিদিব জানে তার নিজের যেমন কমললতা, কেয়ারও একটা পরিগ্রহ আছে। কেয়ার ছোটখাট নড়া শ্বাসফেলা আঙুল নাড়ানোর থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করে, কী সেই পরিগ্রহটা? কী হতে পারে, ভাবে ত্রিদিব। খুব বেশি সাহিত্য তো পড়েনি কেয়া। আরো যা শরীরী

ঘনিষ্ঠতার সঙ্কেতে সমৃদ্ধ — কিছু মিলস-অ্যান্ড-বুন, দু-একটা আলবার্তো মোরাভিয়া, একটু আধটু মারিও পুজো। ট্রেন-প্রেমিকের-কোল-ট্রেন — খোঁজে ত্রিদিব। নাকি সাহিত্য নয়, কোনো সিনেমা? খেলাটা চলতেই থাকে ত্রিদিবের গভীরে। ত্রিদিব জানে, কেয়াও খুঁজছে একই ভাবে। তবে, কেয়া জানে, ত্রিদিব তো ফিল্ম ছাড়া তেমন কিছু ভাবে না, ও নিশ্চয়ই ফিল্ম খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠকিয়ে দেওয়ার একটা মজাও পায় ত্রিদিব। প্রেমিক হাতে ঘিরে রাখে কেয়াকে, ট্রেন ঝমঝম চলতেই থাকে।

তখন শেষরাত, আলো ফুটে উঠছে, ট্রেন ঢুকল গন্তব্যে। আধোঘুম চোখ তির্যক খুলে ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ল ত্রিদিব, হলুদের উপর কালো অক্ষরে, হিন্দিতে আর ইংরিজিতে লেখা, রাজস্থান। চেনা, কিন্তু কী একটা অচেনা, কী একটা গরমিল, অস্বস্তি হল ত্রিদিবের। তারপরেই মনে পড়ল তার, সে তো ইংরিজি আর বাংলায় লেখা দেখে অভ্যস্ত — এখন সে বাংলার বাইরে।

ত্রিদিব জানত, এটাই টার্মিনাস, সব পথের শেষ, তাই তাড়া নেই কোনো, ধীরে ধীরে উঠলে, মাল গোছালে, নামালে তাতে বড় একটা কিছু এসে যাবে না। কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব, বেকারসমস্যা, এর বাইরে বেরোনোর জো কই? রাশি রাশি কুলি হতে চাওয়া মানুষ, তাদের ঝগড়া, মারামারি, চেঁচামেচি। তাদের মধ্যে জাতিভেদ, কেউ সরকারি, কেউ বেসরকারি কিন্তু ইউনিয়নিত, আরো কেউ কেউ একেবারেই বেজাত, কেউই নেই তাদের। তারা আবার বেশিরভাগটাই একদম ছেলেছোকরা। একটি ছেলের একদম কমবয়েসি মুখ। খুব একটা লড়াই করতে শেখেনি এখনো, বড়জোর চোদ্দ কি পনেরো হবে। তার মুখ দেখেই মায়া পড়ে যায় ত্রিদিবের। কারুর হাতে আর মাল দেয় না ত্রিদিব। অপেক্ষা করে। শেষ অব্দি ফাঁকা হয়ে আসে কামরা। ছেলেটা তার দিকে এগিয়ে আসে, ছেলেটাও কি বুঝেছিল ওর জন্যে অপেক্ষাটা? বুঝলে বোধহয় ভালো লাগত ত্রিদিবের। বলে, তেরা কো কুলি মাংতা সাব?

ত্রিদিব কিন্তু ভুল বুঝল তার নিজের অস্বস্তিটা। বাংলা হিন্দি নয়, আসলে রাজস্থান নামে কোনো স্টেশনই নেই। ওটা একটা রাজ্যের নাম। তাহলে কি এই রাজস্থান একটা নির্মিত ভূমি? আর, ছেলেটা যে ভাষায় কথা বলল, সেটা কোন হিন্দি? মুম্বইয়া সিনেমার বাইরে কোন মানুষ ওই ভাষায় কথা বলে, কোথাকার?

হোটেলে ঢোকারও আগে থেকে প্রচণ্ড গতিতে চালু হয়ে গেল প্রোজেক্টের কাজ। একটা এসি লাগানো ডিলাক্স অটোয় চড়ে হোটেল যাওয়ার পথেই পাশাপাশি বসে সেই সমস্ত শুরু করে দিল ত্রিদিব, এবং কেয়া শুরু করল সাড়া দিতে, যা তারা কেউই কখনো করেনি কৈশোর পেরোনোর পর থেকে। আর, প্রতিটি ছোট্ট ছোট্ট অ্যাকশন তাদের গভীর গোপনে ডুবে থাকা স্বতস্ফূর্ততাকে জাগিয়ে তুলছিল : স্লোগান দিতে গিয়েই মানুষ শেখে। জাগো বাঙালি জাগো, ভাঙো তোমার ইনহিবিশন, তুমি এখন বাংলার বাইরে এসেছো, বোধহয় একটা ফিল্মি দুনিয়ায়।

বাঙালি জাগল সত্যিই। কত আলাদা আলাদা রকমেই না জাগল কেয়া আর ত্রিদিব। ভাবাই যায় না। শুধু

যে নানা বিচিত্র পজিশনের সৃষ্টিশীল ভিন্নতায় একই কেয়াকে নানা কেয়া, একই মৈথুনকে নানা মৈথুন বলে মনে হল তাই নয়, নানা গভীরতর সাংস্কৃতিক ছক এবং বোধ এতে ছায়া ফেল্লল। দুজনে দুজনের প্রতি একটু বাড়তি সংবেদনশীলও হয়ে উঠেছিল, হয়ত এই আবহের চাপেই। এবং এই প্রতিটি ক্রিয়াই আজ টিক-ও করছিল। ঘরে ঢুকেই বাথরুমে গেল কেয়া, এবং ত্রিদিব ততক্ষণে সুটকেস থেকে বার করে বিছানার চাদর বদলে ফেলল, যত কাচাই হোক, হোটেলের চাদর তো, কেয়ার পছন্দ হবে এটা, আর আরো পছন্দ হবে যে ত্রিদিব এটা মনে করে করেছে। আবার বাথরুমের দরজা অল্প ফাঁক করে কেয়ার বলে দিতেও ভুল হয়নি, ত্রিদিবের সিগারেট কোন ব্যাগে আছে। কেয়ার এই বলাটা গোটা পরিপ্রেক্ষিতটাকে এতটাই বদলে দিল, ত্রিদিবের মনে হল, বোধহয় এটা অন্য কেউ, অন্য কোনো বিয়ে।

কখনো ফাইবার সুটকেসের উপর দাঁড়ানো কেয়ার আর ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় কলকাতার কায়েত লাস্যে লোল ত্রিদিবকে মিলিয়ে মৈথুনে ছায়া ফেলল লাস্ট ট্যাংগো ইন পারির স্টাকাটো সিঁড়িসঙ্গম। কখনো ছোট্ট কালো সোনির আব্বাসউদ্দিনের আবহে কেয়ার নরম স্তনে ত্রিদিবের লেখক আঙুলের স্বপ্নের ছন্দে বয়ে যাওয়া তৈরি করল তিতাস-একটি-নদীর-নাম প্রেক্ষিত, এমনকি যেন লিলাবালির গানটাও বাদ গেল না। কখনো আবার সকল নাটকীয় উচ্ছ্বাসকে ভুলে একদম শ্বাস নেওয়ার বেঁচে থাকার স্বাভাবিকতায় সম্পৃক্ত একপিস কুইকি বা ছোট্ট মৈথুন, অল্প দূরে টেবিলে রাখা বিস্মৃত ডিনার তাতে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের রাতের আকাশের আশ্চর্য ভাতের গন্ধও খচিত করে দিল। বাঙালি তো শুধু সংস্কৃতি নয়, বিপ্লবী সমাজনীতি সেখানে ছায়া ফেলবেই। সমস্ত অর্থ এবং অর্থান্তরকে মিলিয়ে এক সামগ্রিক প্রোজেক্টোত্তরতায় উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে কেয়া আর ত্রিদিব।

স্বাভাবিক ভাবেই, এর পর, এত মৈথুনের পর, এল এক মদির আবেশঘন অবসন্নতার উইদড্রয়াল। পরে ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে ত্রিদিবের, ভূমি সময় ও বাস্তবতার গভীর গোপন একটা ছক ছিল এখানে। তাকে প্রস্তুত করে নেওয়া হচ্ছিল। সত্যিই তো, এই সুখী পরিপূর্ণতা ব্যতিরেকে একজন তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত মানুষ আর কী খুঁজে পেতে পারে রুটি এবং জল ছাড়া? আর, এটা রাজস্থান, হোটেলের বাইরেই শুধু বালি আর বালি, তৃতীয় বিশ্বের মরুভূমি, গরিব মানুষ সেখানে শুধু রুটি আর জলই খোঁজে। কোনো খোঁজাই তার বাইরে বেরোতে পারে না। তাই, তাকে ত্রিদিবকে প্রস্তুত করে নেওয়া হচ্ছিল, ওই খোঁজাকে অতিক্রম করে এক গভীরতর আবিষ্কারের জন্যে।

প্রবীনা সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে বালিয়াড়িতে, চাঁদও থাকে সেখানে। ফিল্মে যেমন ঠিক তাই তাই ঘটে, চিত্রনাট্য যা চাইছিল। ঝুরঝুর করে বালি ঝরে পৃথিবীর নাভিমূলে। বালি সময় বালি। ত্রিদিবের মা-বাবা মারা গেল সুদূর বাল্যে। খুব জ্বর হত তার। নিঃসঙ্গ একাকী জ্বরের বিছানায়, মাথা নাড়ে শুধু পায়ের ধারে জানলায় কার্নিসের অস্থায়ী অশ্বত্থের পাতা, যেন কথা বলে তারা, কত অভিব্যক্তি খেলা করে চলে

তুলতুলে সবুজ পাতায়, সারাদিন ধরে, বদলাতে থাকা আলোয়, কলকল কলকল, অশ্বত্থ উপড়ে যাবে, পাতারা, জ্বরের বিছানায় শুয়ে ত্রিদিব টের পেত বালি নড়ছে মাথা জুড়ে, কত বালি, অফুরান, অমোঘ, অশেষ বালি, বালি তো তাই সবকিছুই যা হয়ে যায় একদিন, আজ বা কাল, এক দিন, দুই দিন, তিন, চার, বালি বাড়ছে মরুভূমিতে, বালিয়াড়ির পথ অন্তহীন পথ বেড়ে চলে, বেড়েই চলে, পথ বেয়ে ঘোড়সওয়ার আসে, রক্ত হত্যা ইতিহাস, আর্য অনার্য সব রক্ত বালি হবে একদিন, সব দেহ, সব মায়া, চলো কেয়া ল্যান্ডস্কেপ দেখে আসি মরুভূমির, পুরো পিকচার পোস্টকার্ড না, বলো কেয়া? দক্ষিণে লোথাল থেকে উত্তরে বিকানীর — এই রাজস্থান মরুভূমি জুড়েই তো গোটা অনার্য প্রতিরোধের ডিসপ্লে — কী থ্রিলিং?

দক্ষিণাপণের রাজস্থলী লং-স্কার্ট, মেরুন-হলুদ বাঁধনি, চারু সুতোয় বোনা কত চুমকি আয়না, এক চাঁদ অগণ্য হয়েছিল এই বালিয়াড়ি রাতে, যাদু ঘিরে এসেছিল। অজস্র চাঁদে চন্দ্রাহত বালিয়াড়িতে হাওয়া দেয়, বালি দোলে নড়ে, স্তর থেকে স্তরান্তর, বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে ন্যাট-জিও বৃশ্চিক, অ্যানিমাল প্লানেটও হতে পারে, শিকারের পিছনে শিকারী এসেছিল, ঝুরো বালির শরীরে সর্পিল রেখা এঁকে নড়ে ডিসকভারিফেরত মরুসর্প।

এমন রাতে সব হয়। বালিতে উবু হয়ে বসে ট্রেনের কিশোর কুলি। ভালো লেগে গেছে হয়ত, তাদের সঙ্গেই আছে, হোটেল থেকে বেরোলেই। ত্রিদিবকে দেখায়, দশ আঙুলের অক্ষত হাত উঁচিয়ে, ওঁহা উস পার হ্যায় ও দুনিয়া। ত্রিদিব মাথা উঁচিয়েছিল, ঝটিতি তার কাঁধ ধরে টেনে নামায় কিশোর, ঝুক যাও সাব, হাওয়া আতি হ্যায় না, উস পার কি হাওয়া। কিশোরের তরুণ চাঁদঝলমল মুখে দেখেছিল ত্রিদিব কচি অশ্বত্থপাতার ঝকমকে অভিব্যক্তি — গুপ্ত-দিশা দেওয়ার উত্তেজনা, অজানার ভয়, আউটসাইডার ত্রিদিবের অনপড়ত্বে বালক হাসি। ওর হাসি দেখে নিজের বোকামিকেই বেশ লাগে এখন ত্রিদিবের। যাবি ওখানে? তু কেয়া পাগল হ্যায় সাব? ম্যাচিওর্ড হওয়ার কায়দা দেখায় কিশোর, কিন্তু তার মুখে রোমাঞ্চ এল।

অগণ্য চাঁদের অনন্ত চন্দ্রিমায় চন্দ্রাহত ত্রিদিব উস-পার-কি-হাওয়ার বয়ে নিয়ে আসা বালি থেকে চোখমুখ বাঁচাতে বাঁচাতে বালিতে বুক ঘষে এগোয়, আর এক অশ্বত্থামা, এ জগত বৃশ্চিক আর মরুসর্পের, তাদের ব্যাকরণ ভাঙার সাধ্য কী তার, বুকে তো হাঁটতেই হবে, সরীসৃপ হতেই হবে। বালকটি তার সঙ্গেই থাকে, একটু পিছনে। একটু আগে ও-ই বলেছিল, উস-পার থেকে সোনা নিয়ে ফেরা যায় আঁধি পেরিয়ে, নিজের রেখে আসা আঙুলের সমান মাপের সোনা। আর ও পারের হদিশ নিয়ে ফেরা যায় যদি কেউ সব কিছু রেখে আসে, এমনকি তার সঙ্গীকেও। সেই সঙ্গী তখন সোনা হয়ে রয়ে যায় ওই পারে। সন্তানবলির পরে বুকে হেঁটেছিল অশ্বত্থামা, ত্রিদিব তার বলিকে সঙ্গে নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোয় ভূমির সময়ের যুক্তির পরপারে। পাগল না-হয়ে সেখানে যাওয়া যায় না। সেই পারের হদিশ-ও মেলে না। সোনা দিয়ে

কী হবে তার? আঙুলহীন লোকে রাজস্থান তো ভরে যাচ্ছে। তার, ত্রিদিবের চাই হদিশ। পরপারের অন্যপারের হদিশ। সেই হদিশ সে রেখে যাবে তার লেখায়। তার লেখা তাই পেরিয়ে যাবে ভূমি আর কাল।

ঘুমও এসে যাচ্ছিল ক্রমে, কাজও আছে কিছু, কাল সকালেই ট্রেন, ফিরেই লেবার-কমিশনারের সঙ্গে মিটিং, তার কিছু নোটস-ও বাকি আছে এখনো। বালি আকাশ হাওয়া আর চাঁদের আলো মিশে একাকার ধূসর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে একবার বোঝার চেষ্টা করে কেয়া, কতদূর পৌঁছল ওরা? একটু বিরক্ত লাগে এই সব উদ্ভটতায়, কিন্তু একটা প্রশান্তিও থাকে এখন কেয়ার ভিতর। তাদের প্রোজেক্ট সফল, অন্য মাইলস্টোন এখনো দূর-অস্ত। কিন্তু আর না, বড্ড রাত হয়ে যাচ্ছে, হোটেলের দিকে হাঁটা দেয় কেয়া।

পরের দিন সকালে, একটু নিশি-ডাকা চোখে, আসলে নিশি-ডাক থেকে ফেরত-আসা, ত্রিদিব বসে থাকে ট্রেনে। সিগারেট জ্বলে যাচ্ছে হাতের আঙুলে। ধোঁয়ায় অসুবিধে হওয়ার মত কোনো মানুষই নেই সামনে। সম্পূর্ণ নির্মানুষ গোটা কামরাটা। সোনা পাওয়ার দেশ রাজস্থান থেকে সত্যিই তো কেউ ফেরে না আর। নিচের বাঙ্কে কেয়া ঘুমোচ্ছে। একটু ক্লান্ত। কাল অনেক রাত অব্দি কাজ করেছে। কাল রাতে বালি থেকে ফেরার পথে কেয়া যা ভাবছিল, সেই একই ভাবনা এখন ত্রিদিবেরও মাথায় কাজ করে। শুধু মাত্র একটা মাইলস্টোন বিয়ে-কে সামনে রেখে তাদের লং-ডিসটান্স দৌড় জারি রাখার প্রোজেক্ট এক অর্থে সম্পূর্ণ সফল. কলসাতায় ফিরে এখন তার একটাই কাজ। ভূমি কাল আর চিন্তনের পরপারের আখ্যান লিখে ফেলা। বিয়ে বা ডিভোর্স কিছুতেই কিছু আর এসে যায় না। বরং ডিভোর্স মানেই তো ফের নতুন কিছু ঝঞ্ঝাট। কাজের ব্যাঘাত। এখন তার একটাই কাজ। ওই কিশোরকে ডেডিকেট করে একটা উপন্যাস লিখবে ত্রিদিব, তাতে রেখে যাবে পরপারের সব রহস্যের হদিশ। সে মারা যাবে, এই উপন্যাস পল্লবিত হতে থাকবে তার পরেও।